উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের সূচনাকালে ভারতবর্ষে শিক্ষা ব্যবস্থায় নারী শিক্ষার বিষয়টি ছিল একেবারে নড়বড়ে, সুসংগঠিত কোন পরিকাঠামো ছিল না। তৎকালীন সমাজে নারীর অবস্থান ও দাসের অবস্থানের মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য ছিল না। রাষ্ট্র বা সমাজ কর্তৃক নারীসত্তার কোন স্বীকৃতি ছিল না, নারীর অধিকার যে পুরুষের সমান, তাও সমাজ ভাবত না। কিন্তু বিভিন্ন সাহিত্য ও ইতিহাস গবেষকদের মতামত থেকে জানা যায় যে বৈদিক যুগে অর্থাৎ ৪০০০ - ১০০০ খ্রিস্টপূর্ব সময় কালে মহিলারা ভারতীয় সমাজে সম্মানের সঙ্গে বসবাস করত। সেই সময় মহিলাদের শারীরিক এবং বৌদ্ধিক বিকাশের সুযোগ ছিল। মহিলারা সমাজের পুরুষদের মত সমান স্বাধীনতা উপভোগ করতে পারত এবং মহিলাদের ক্রিয়া-কলাপের উপর

কোন বিধিনিষেধ আরোপ করা হত না। কিন্তু শতাব্দী পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মহিলাদের পরিস্থিতি ও পরিবর্তন হতে শুরু করে। যদিও রেনেসাঁ বা নবজাগরণের সূত্রপাত হয়েছিল উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ থেকেই। তবুও এই সমাজে নারীর অবস্থান একেবারে শোচনীয় ছিল। পুরুষের অর্জিত অন্যান্য সম্পদের মত নারীরাও একটা সম্পদ ছিল মাত্র। সমাজে নারীকে সংসারের সমস্ত দায়-দায়িত্ব পালন, সন্তান জন্মদান-প্রতিপালন -এই সবকিছু ছিল নারীর জীবনে একমাত্র লক্ষ্য ও কর্তব্য। এই শতকে হিন্দুধর্মের গোঁড়ামি, পিতৃতন্ত্র, জাত ব্যবস্থা, বাল্যবিবাহ ও উচ্চ শ্রেণীর বিধবা মহিলার নিয়মের বেড়াজাল প্রভৃতি ক্রমশ মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থায় এইরকম পরিস্থিতিতে হিন্দু নারীদের অবস্থার উন্নতির জন্য নারীদের শিক্ষিত করতে এবং হিন্দুদের গোঁড়ামি ও পিতৃতন্ত্রের বেড়াজাল থেকে নারীদের মুক্তির উদ্দেশ্যে একজন সমাজ সংস্কারক উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে ভারতের কর্ণাটক রাজ্যে কার্কালের কাছে গঙ্গামূলে অনন্ত শাস্ত্রী ডোংগ্রের কনিষ্ঠা কন্যা রূপে ২৩ এপ্রিল ১৮৫৮ সালে উচ্চবংশীয় ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন রামাবাই। সমাজ সংস্কারক, জ্ঞানী পণ্ডিত ও বুদ্ধিজীবী হলেন অনন্ত ডোংগ্রের কন্যা রামাবাই [illegible]

রামাবাইয়ের পিতা অনন্ত শাস্ত্রী বেদ, পুরাণ ও অন্যান্য ধর্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করে এই সি[illegible] সমাজে নারী শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম। রামাবাইয়ের পিতা একজন প্রখ্যাত সংস্কৃত পণ্ডিত, যি[illegible] বাহ্যিকভাবে গোঁড়া ব্রাহ্মণ পরিবারের মহিলাদের জন্য শিক্ষা গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। তাঁর অভিমত ছিল মহিলাদের পবিত্র প্রাচীন ভাষা সংস্কৃত শেখার অনুমতি দেওয়া উচিত, যাতে মহিলারা হিন্দুদের ধর্মীয়গ্রন্থ গুলি বিনাবাধায় পড়তে পারে। অনন্ত শাস্ত্রী ডোংগ্রে নিজ পত্নী লক্ষীবাইয়ের পাশাপাশি অন্যান্য সন্তানদের কেবল লেখাপড়া শিখিয়েছেন তাই নয়, তিনি বাল্যবিবাহের বিরোধিতা করেছিলেন এবং মাত্র নয় বছরের বালিকা রামাবাইয়ের বিয়ের কথা বললে তা তিনি অস্বীকার করেন। এই প্রকার কাজের জন্য তাঁকে সমাজচ্যুত করা হয়। কারণ, উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে নারীদের শিক্ষা গ্রহণের কোন অধিকার ছিল না এবং বাল্যবিবাহের প্রচলন ছিল। সমাজচ্যুত হওয়ার ফলে বাধ্য হয়ে অনন্ত শাস্ত্রী সপরিবারে বনাঞ্চলে গিয়ে বসবাস শুরু করেন। পরবর্তী সময়ে রামাবাইয়ের পিতা তীর্থযাত্রীর জীবন গ্রহণ করেন। কারণ, তিনি তাঁর উদার মনস্কতার জন্য সমস্ত সম্পত্তি হারিয়েছিলেন ও মন্দির বা অন্য কোন নির্জন স্থানে পৌরাণিক গ্রন্থ পাঠ করার পথটি বেছে নিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি কন্যা রামাবাই সহ সমগ্র ভারতবর্ষ পায়ে হেঁটে ভ্রমণ করেন । এমতাবস্থায় পিতা-মাতা রামাবাইয়ের পড়াশোনার দিকে বিশেষ যত্ন নেন। মাত্র ১২ বছর বয়সে রামাবাই হিন্দু ধর্মগ্রন্থ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার আঠারো হাজার শ্লোক আত্মস্থ করেছিলেন। ১৯৭৭-৭৮ সালের ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের সময়কালে রামাবাইয়ের পিতা অনন্ত শাস্ত্রী ও মাতা লক্ষীবায় উভয়েই মারা যান। পিতা মাতার মৃত্যুর পর রামাবাই ভাইকে সঙ্গে নিয়ে তাঁর পিতার দেখানো পথ অনুসরণ করেন। সমগ্র ভারতবর্ষ সফরের ফলস্বরূপ রামাবাই উচ্চবর্ণের বিধবা মহিলাদের নিষ্ঠুর জীবনযাপন প্রত্যক্ষ করার সুযোগ পেয়েছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত তিনি অসহায় শিশু বিধবাদের সহায়তা করার জন্য এগিয়ে আসেন। ১৮৭৮ সালে কলকাতায় আসার পর রামাবাইয়ের সংস্কৃত শাস্ত্র বিষয়ে অসাধারণ পাণ্ডিত্য এবং প্রাচীন ধর্মীয় শাস্ত্র সমূহের জ্ঞান দ্বারা সংস্কৃত পণ্ডিত মহলকে অবাক করেন। প্রাচীন ধর্মগ্রন্থগুলির উপর রামাবাইয়ের দক্ষতা দেখে পন্ডিত মহল এতটাই মুগ্ধ হয়েছিল যে রামাবাইকে 'পন্ডিতা' (জ্ঞানী ব্যক্তি) এবং 'সরস্বতী' (শিক্ষা দেবী) উপাধিতে ভূষিত করা হয়েছিল। পরবর্তীতে তিনি একজন জনপ্রিয় ব্যক্তিত্ব হয়ে ওঠেন এবং কলকাতার বুদ্ধিজীবী দলে যোগদান করেন। কলকাতায় থাকাকালীন তিনি ব্রাহ্মসমাজের সংস্পর্শে আসেন। তিনি শীঘ্রই ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিলেন এবং উত্তর ভারত জুড়ে মহিলাদের বন্ধনমুক্তি বিষয়ে বক্তৃতা দিতে শুরু করেন। তৎকালীন সময়ে ভারতের সমাজব্যবস্থায় সর্বোচ্চ উপাধি ছিল “সরস্বতী”। তখন থেকেই

তাঁকে "পন্ডিতা রামাবাই" বলে সম্বোধন করা হত। এরপর তিনি বালিকা বিবাহ বন্ধ করার উদ্দেশ্যে এবং নারী শিক্ষার প্রচলনে মনোনিবেশ করেন। ১৮৮০ সালে কলেরা রোগে ভাইয়ের মৃত্যুর পর রামাবাই ভাইয়ের বন্ধু নিচু শ্রেণীর একজন শূদ্র বাঙালি আইনজীবী বিপিনবিহারীমেধাবীর সঙ্গে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন ২২ বছর বয়সে। ব্রাহ্মণ হয়ে নিচু জাতের লোককে বিয়ে করা ছিল তৎকালীন সমাজে রীতিমত ধর্ম বিরুদ্ধ কাজ। সমাজের বিরুদ্ধে গিয়ে বিবাহ করে তিনি তাঁর কুসংস্কারমুক্ত মানসিকতার এবং অদম্য সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছিলেন। বিবাহের পর পুনরায় রমাবাই স্বামীকে সঙ্গে নিয়ে নারী শিক্ষার দিকে মনোনিবেশ করেন। তিনি ও তাঁর স্বামী বিপিনবিহারী মেধাবী বিধবাদের জন্য স্কুল চালু করার চিন্তাভাবনা শুরু করেন। তৎকালীন সমাজে স্ত্রী শিক্ষা ধর্ম বিরুদ্ধ বলে বিবেচিত হত। তিনি ২৩ বছর বয়সে মনোরমা নামে এক কন্যার জন্ম দেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য ক্রমে মাত্র কয়েক মাসের মধ্যেই রমাবাই বৈধব্য প্রাপ্ত হন। নিজেকে প্রচলিত বৈধব্য জীবনের কাছে সমর্পণ করা সত্ত্বেও তিনি তাঁর লক্ষ্য স্থির করেন এবং ভারতীয় সমাজে বিশেষত মহিলাদের বৈধব্য যুবতী জীবনেকে সমাজে ধর্মীয় গোঁড়ামির বেড়াজাল থেকে মুক্ত করতে নিজের জীবনকে উৎসর্গ করেন। রামাবাই কর্তৃক রচিত "Stri Dharma Niti" (Morals for women) (1882) এবং "The High Caste Hindu Women" (1888) বইগুলোতে তিনি হিন্দু বৈধব্য জীবনের অন্ধকার দিকগুলি অঙ্কিত করেছেন।

রামাবাইয়ের জীবন ও জীবন যুদ্ধ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে পিতৃতন্ত্র বিষয়ে একটা সম্যক ধারণা লাভ প্রয়োজন। সাধারণভাবে পিতৃতন্ত্র বলতে বোঝায় "পিতার শাসন" বা "rule of the father"। আসলে পিতৃতন্ত্র বলতে প্রাচীন সমাজে পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠ পুরুষ ব্যক্তিকে, যিনি পরিবারের সার্বিক নিয়ন্ত্রক। আধুনিক সমাজও প্রাচীন এই প্রথাকে বয়ে নিয়ে চলেছে। সাধারণভাবে "তন্ত্র" কথাটির আভিধানিক অর্থ ব্যবহার, নিয়মাদি, পরিবীক্ষণ বা শাসন। মানুষ যখন দলবদ্ধ হল অর্থাৎ গোষ্ঠী বা দল তৈরী করল, তখন থেকেই কোন না কোন তন্ত্রের অধীনে সমাজবদ্ধ হল। গোষ্ঠীতন্ত্র থেকে ধীরে ধীরে মাতৃতান্ত্রিক বা মাতৃসূত্রীয় সমাজের উত্তরণ ঘটল। এরপর নানা বিবর্তনের মধ্য দিয়ে পিতৃতান্ত্রিক বা পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার প্রচলন ঘটল। সামাজিক দিক থেকে গোষ্ঠীতন্ত্র, মাতৃতন্ত্র বা পুরুষতন্ত্র এসে সমাজকে শৃঙ্খলাবদ্ধতা করার প্রয়োজনে কিছু সামাজিক নিয়মবিধি বা তন্ত্রের অলিখিতভাবে প্রচলন করল। ক্রমে পুরুষতন্ত্র পুরুষ শ্রেণির স্বার্থ-সুবিধা রক্ষায় এক অনিবার্য সামাজিক বিধান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে থাকল। পুরুষরা তো বটেই, নারীরা পর্যন্ত পুরুষতন্ত্রের দাসে পরিণত হল এবং পারিবারিক ও সামা[illegible] পুরু সুবিধা পুরুষরা উপভোগ করতে শুরু করল এবং নারীরা সমাজের অবহেলিত, লাঞ্[illegible] শ্রে হিসেবে সমাজের একটা অংশ হয়ে রইল।

রামাবাইয়েরস্বামীর মৃত্যুর পরেও রামাবাইয়ের অদম্য উৎসাহের কোন ছেদ পড়েনি। তিনি বৃত্তি নিয়ে উচ্চশিক্ষার জন্য কলকাতা ছেড়ে ইংল্যান্ডে যান। সেখানে গিয়ে তিনি খ্রিস্টান মিশনারীদের সংস্পর্শে আসেন এবং মিশনারিদের প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা প্রভাবিত হন। ভারতে ফিরে আসার পূর্বে তিনি অল্প বয়সী কন্যাকে নিয়ে খ্রিস্টান ধর্মে ধর্মান্তরিত হওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। ধর্মীয় গোঁড়ামির ফলে বিশেষ করে হিন্দু উচ্চবর্ণের বৈধব্য প্রাপ্ত মহিলাদের অবস্থা শোচনীয় ছিল। তৎকালীন বর্ণশাসিত সমাজে নয় বছরের বালিকা কন্যাকে বিয়ে দেওয়ার প্রথা চালু ছিল। এই বিবাহ দেওয়া সম্পূর্ণ হলে পিতার অশেষ পূণ্যলাভ হয় বলে সমাজ মনে করত। বঙ্গদেশে এই প্রথাকে বলা হত গৌরিদান। গৌরীদানে পিতা অপারগ হলে হাতেনাতে ফল প্রাপ্তি সমাজচ্যুতকরণ। বালিকাদের সম্মতি -অসম্মতির উপর কোন গুরুত্ব তো ছিলই না বরং অবধারিতভাবে সৃষ্টি হত বাল্য বিধবার আরেকটি শ্রেণি । যদিও "ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের" প্রয়াসে

উপনিবেশিক সরকার ১৮৫৬ সালে বিধবাদের পুনর্বিবাহের আইন চালু করেন। তার বাস্তবায়ন ছিল সুদূর পরাহত। প্রচলিত ধারণা ছিল বাল্য বিধবারা জন্ম-জন্মান্তরের পাপীয়সী নারী। এদের দায়দায়িত্ব নেওয়ার অধিকার কারও ছিল না। তাই এই বাল্যবিধবারা অকথিত ভাবে নির্যাতিত, অবহেলিত ও সামান্য দোষে সমাজ থেকে বহিষ্কৃত অসহায় কতগুলি প্রাণী ছিল মাত্র। প্রচলিত কোন আইন কানুন নারীশিক্ষার পক্ষে তো ছিলই না, অঞ্চল বিশেষে নারী শিক্ষা ও দণ্ডনীয় অপরাধ ছিল। সেই হিন্দু বিধবা মহিলাদের পুনর্বাসনের জন্য সামাজিক কাজে রামাবাই সক্রিয়ভাবে নিযুক্ত হন। এই প্রয়াসে রামাবাই খ্রিস্টান মিশনারীদের কাছ থেকে আর্থিক সহায়তা লাভ করেন। কাজের ফলস্বরূপ রামাবাই হিন্দু ব্রাহ্মণদের পাশাপাশি খ্রিস্টান মিশনারীদের সমালোচনার শিকার হন। হিন্দু ব্রাহ্মণরাও ক্ষুব্ধ হয় তাঁর ওপর। কারণ, রামাবাইয়ের ব্রাহ্মণ বিধবাদের পূনর্বাসনের কাজের বিষয়টি ছিল পুরুষতন্ত্রের ইচ্ছার বিরুদ্ধে। আর খ্রিস্টান মিশনারীদের রাগান্বিত হওয়ার কারণ ছিল, রামাবাইয়ের সামাজিক কাজের কৌশলে ধর্মান্তকরণের বিষয়টি লঘু হয়ে যাওয়ার বিষয়টি।

এরপর রামাবাই কলকাতা ছেড়ে পুনাতে যান। পুনাতে গিয়ে রামাবাই প্রথম বছরেই তিনটি তাৎপর্যপূর্ণ কাজ করেন। প্রথমত; উচ্চবর্ণের প্রগতি মনস্কা যেসব নারী বালিকাদের শিক্ষা দেন এবং বাল্যবিবাহের বিরোধিতা করেন, তাঁদের নিয়ে 'আর্য মহিলা সমাজ'প্রতিষ্ঠা করেন। দ্বিতীয়ত; রামাবাইয়ের লিখিত প্রথম বই " স্ত্রী ধর্মনীতি" মারাঠি ভাষায় প্রকাশিত হয়েছিল যার ইংরেজি অনুবাদ "Morals for women " প্রকাশ পায়। তৃতীয়ত; ১৮৮২ সালে ভাইসরয় লর্ড রিপন কর্তৃক শিক্ষা ব্যবস্থা খতিয়ে দেখার জন্য গঠিত, "Hunter Commission on Education -এর কাছে তিনি সাক্ষ্য প্রমাণ দাখিল করেন। এই সাক্ষ্যপ্রমাণে তিনি বলেন যে, দেশের শিক্ষিত পুরুষদের মধ্যে শতকরা নিরানব্বই জনই স্ত্রী শিক্ষার বিরোধী। পুনাতে গিয়ে রামাবাই ১৮৮১ সালে নারীদের মুক্তির জন্য একটি "আর্য মহিলা সমাজ" নামে সংগঠন গড়ে তোলেন সমাজে একটি সুনির্দিষ্ট সামাজিক শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার জন্য এবং অতীতের আর্য বৈদিক সমাজের পুনর্নির্মাণের ধারণা নিয়ে। সমাজে ধর্মীয় গোঁড়ামি ও পিতৃতন্ত্রের বেড়াজাল থেকে থেকে মহিলাদের মুক্তির জন্য পন্ডিতা রামাবাই আর্য মহিলা সমাজের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করেন। UmaChakravarti -এর মতে, (Rewriting History:The Life and Times of Pandita Ramabai';1998) "আর্য মহিলা সমাজ" প্রতিষ্ঠিত হয়েছে পুরুষতন্ত্রের আধিপত্য দূরীভূত করার একটি সংস্থা হিসেবে। তিনিও এই অভিমত পোষন করেন যে পন্ডিতা রামাবাই ধর্মীয় গোঁড়ামি ও সামাজিক কুসংস্কার থেকে মহিলাদের মুক্ত করতে চেয়েছেন। উনবিংশ শতাব্দী দ্বিতীয়ার্ধে এই সময়কালে সমাজে গোঁড়া হিন্দুদের দাসত্ব, অল্প বয়সে বিধবা হওয়া, বহুবিবাহ ও বৃদ্ধদের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া ইত্যাদি সামাজিক অন্যায়ের ফলে মহিলাদের সমস্যা ক্রমশ ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করে। এইসব সমস্যা থেকে রামাবাই নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারেননি, গভীরভাবে এই অবস্থার সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেন। ১৮৮৯ সালে রামাবাই পুনায় প্রত্যাক্ষিত দুস্থ পরিবারের মহিলাদের জন্য "মুক্তি মিশন" প্রতিষ্ঠা করেন। এই মুক্তি মিশন সমাজকল্যাণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। এই মিশনে বিধবা মহিলাদের আশ্রয়ের সঙ্গে সঙ্গে বৃত্তি মূলক শিক্ষা দেওয়া হত এবং দরিদ্র, অসহায় এবং অন্ধ মহিলাদের পরিষেবা দেওয়া হত। এছাড়াও ব্রিটিশ সরকার ভারতে ১৮[illegible] শিক্ষা বিষয়ক যে কমিটি গঠন করেন, সেই কমিটির কাছে রামাবাই শিক্ষকদের জন্য প্র[illegible] বা মহিলাদের স্কুলে ইন্সপেক্টর নিয়োগ এবং নারীদের চিকিৎসার জন্য যে মহিলা ডাক্তার প্রয়োজন সেই কারণে মেডিকেল কলেজে মেয়েদের ভর্তি হওয়ার সুযোগ দেওয়ার সুপারিশ পেশ করেন। এই সুপারিশের প্রভাবে তৎকালীন সময়ে বিপুল আলোড়নের সৃষ্টি হয়। যার প্রেক্ষিতে পরবর্তীতে লেডি ডাফরিন মেয়েদের

মেডিকেল কলেজে শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ দেওয়ার জন্য আন্দোলন করেন। ১৮৮৩ সালে রামাবাই শিক্ষক হিসাবে উচ্চতর প্রশিক্ষণের জন্য ইপিসকোপালিয়ান চার্চে যোগ দেন। এই চার্চের আমন্ত্রণে রামাবাই ১৮৮৬ সালে শিক্ষালাভের জন্য আমেরিকায় গমন করেন। আমেরিকা থেকে ফিরে এসে বোম্বেতে তিনি মহারাষ্ট্রের প্রথম কিশোরী বিধবাদের জন্য স্কুল ও হোস্টেল "সারদা সদন" চালু করেন ১৮৮৯ সালে। নিজ প্রচেষ্টায় সারদা সদনের আশ্রিতদের চিকিৎসা বিষয়ে সেবাদানের সুবিধার জন্য ১৯১১ সালে ডেভিড সাসুন হাসপাতলে নার্সিং ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করেন। রামাবাই নিজ উদ্যোগে ছাত্রীদের জন্য বোর্ডিং হাউস ও চালু করেন। পরবর্তীকালে সারদা সদন শিক্ষকদের জন্য প্রশিক্ষণ ক্লাস, পাবলিক স্কুল, ডিপার্টমেন্ট অফ মেডিক্যাল সার্ভিস এবং গার্হস্থ্য বিজ্ঞান, প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্র, স্পোকেন ইংলিশ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র শুরু করেন। পরবর্তীতে রামাবাই এই সারদা সদন বোম্বে থেকে পুনাতে স্থানান্তরিত করেন এবং সারদা সদনের নামে একটি ট্রাস্ট গঠন করেন। এই সময় তিনি আশ্রিতাদের জীবিকা অর্জনের জন্য জমি ক্রয় করে "মুক্তি সদন ফার্ম" গড়ে তোলেন। এখানে একটি স্কুলে একত্রে ৪০০ জনছাত্রীকে শিক্ষা দেওয়ার বন্দোবস্ত করা হয়। ১৯০০ সালের দুর্ভিক্ষের সময় রামাবাইয়ের নেতৃত্বে কয়েকশো দুর্ভিক্ষ পীড়িত অসহায় নারী আশ্রয় পায় এই আশ্রমে।

রামাবাইয়ের কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত "আর্য মহিলা সমাজ" সংস্কৃত শিক্ষার জন্য স্থাপিত হয়। Nobel Women Society স্থাপিত হয় নারীশিক্ষার বিস্তার লাভের এবং বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে আন্দোলনের জন্য। আর্য মহিলা সমাজের প্রভাব আহমেদনগর, থানে, বম্বে, সোলাপুর, গন্ধারপুর প্রভৃতি স্থানে বিস্তার লাভ করে। কেবলমাত্র সংস্কৃত শিক্ষার মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে, সামাজিক রীতিনীতি ও কুপ্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলনে তা উত্তাল হয়ে উঠল। এইরকম সামাজিক অস্থিরতার পরিস্থিতি বর্ণনা করা রয়েছে রামাবাইয়ের লেখা "Stri Dharma Niti" গ্রন্থে। পণ্ডিতা রামাবাইয়ের সংগ্রাম শুধুমাত্র নারী শিক্ষা ও হিন্দু উচ্চবর্ণের মহিলাদের আন্দোলনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, রাজনৈতিক অঙ্গনেও ছিল তাঁর দ্রুত পদচারণা। শ্রমিকদের নিপীড়নের বিরুদ্ধে ও তাঁর প্রতিবাদী কণ্ঠ ছিল সোচ্চার। কলোনীর শ্রমিকদের উপর যখন শাসকশ্রেণীরা অত্যাচার করেছিল তখন তিনি তার প্রতিবাদে জনসমাবেশ করে সরকারকে তীব্র ভাষায় সমালোচনা মাধ্যমে জানিয়েছিলেন যে "জনগণ যেমন সরকারের নিকট বাধ্য থাকবে, তেমনি সরকারকে ও জনগণের নিকট দায়িত্ব পালনে ,তাঁদের অধিকার পূরণে বাধ্য থাকা উচিত।' ১৯০৪ সালে ভারতের মহিলা পরিষদের প্রথম সভায় তিনি সভা নেতৃত্ব করেন। ১৯০৮ সালে সুরাটে, ১৯১২ সালে বোম্বাইতে এবং ১৯২০ সালে সোলাপুরে ভারত মহিলা পরিষদের অধিবেশন গুলোতেও সভার নেতৃত্ব দেন। ভারতের নারীর ভোটাধিকারের আন্দোলনের সাথে ও রামাবাই ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন। দীর্ঘ ছয় বছর নারীর ভোটাধিকারের আন্দোলনের নেতৃত্ব দেওয়ার পর ১৯২৩ সালে বোম্বাই নারীদের ভোটাধিকার অর্জিত হয়। রামাবাই বোম্বাইয়ে সারদা সেবা সদনের সভানেত্রী ছিলেন।

পরিশেষে বলা যায় রামাবাই ভারতে কিন্ডারগার্টেন শিক্ষা ব্যবস্থার পাশাপাশি বৃত্তিমূলক শিক্ষা ব্যবস্থার পথিকৃৎ ছিলেন। রামাবাইয়ের অভিমত অনুযায়ী পাঠক্রম হবে নৈতিক মূল্যবোধের ভিত্তিতে সাহিত্যে অনুকম্পা ও সংবেদনশীলতার পাশাপাশি নৈতিক গুনাবলী সম্পূর্ণ। শরীরবৃত্তীয় ও জীববিজ্ঞানের পাশাপাশি আমাদের চারপাশের প্রাকৃতিক জগৎ সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞান শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে সংযুক্ত করার কথা বলেছিলেন। এছাড়াও রামাবাই বিশ্বের প্রথম মহিলা অনুবাদক, যিনি খ্রিস্টান ধর্মগ্রন্থ হিব্রু ভাষায় রচিত বাইবেল গ্রন্থটি মারাঠি ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন। তিনি জীবনের ১২ বছর এই অনুবাদের জন্য উৎসর্গ করেছিলেন এবং ১৯২২ সালে ৫ই এপ্রিল ৬৪ বছর বয়সে মারা যাওয়ার পূর্বে মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগে

তিনি এই খসড়াটি সম্পূর্ণ করেছিলেন। মারাঠি ভাষায় অনূদিত বাইবেল গ্রন্থটি প্রতিটি গির্জায় পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হয়েছিল। রামাবাই জীবনের অধিকাংশ সময়ই নারী মুক্তি সংগ্রাম ও সমাজের কুসংস্কারের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন। এই সমস্ত কর্মকান্ডের জন্য ১৯১৯ সালে ব্রিটিশ সরকার পন্ডিতা রামাবাইকে "কসর-ই-হিন্দ" পুরস্কারে ভূষিত করেন। তৎকালীন সময়ে ব্রিটিশ রাজত্বকালে ভারতে সর্বোচ্চ সম্মাননা রামাবাই পুরস্কারটি লাভ করেছিল। মৃত্যুর পর ভারত সরকারের সম্মান জ্ঞাপন রামাবাইয়ের একটি স্মারক ডাকটিকিট জারি করেন তাঁর অবদানকে স্বীকৃতি জানিয়ে। "A. B. Shah" -এর মতে, একজন লেখক পন্ডিতা রামাবাই আধুনিক ভারতের সর্বোচ্চ মহিলা এবং ইতিহাসের অন্যতম সেরা ভারতীয় হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন। পুরুষতান্ত্রিক ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজে মেধা, মনন, পরিশ্রম ও সাহসিকতা দিয়ে যুগে যুগে যেসব নারীরা আজকের অবস্থান তৈরি করেছে এবং নারীর তথা সমাজের অগ্রযাত্রাকে যাঁরা গতিশীল করেছেন, পন্ডিতা রামাবাই তাদের মধ্যে একজন। পন্ডিতা রামাবাইয়ের সংগ্রামী ইতিহাস যুগে যুগে নারীর অগ্রযাত্রাকে আরও প্রেরণা ও উৎসাহ জোগাচ্ছে। নারীর পদযাত্রাকে আরও দৃঢ় করে তুলতে সক্ষম হয়েছে।